ইউরোপ নিজেই যেভাবে তার উদ্বাস্তু সংকট সৃষ্টি করেছে

এটি 'How Europe Created Its Own Refugee Crisis' শীর্ষক লেখার অনুবাদ। মূল লেখাটি গত ২১ এপ্রিল ২০১৫ ল্যাটিন আমেরিকাভিত্তিক বিকল্প গণমাধ্যম টেলিসুরে (La Nueva Televisora del Sur বা The New Television Station of the South) ওয়েবসাইটের নিজস্ব বিশ্লেষণ হিসেবে প্রকাশিত হয়। সর্বজনকথার জন্য অনুবাদ করেছেন প্রকৌশলী ***তন্ময় কর্মকার****।*

বিপুলসংখ্যক বাস্তুচ্যুত মানুষের ইউরোপ গমনচেষ্টার প্রবল স্রোত কিভাবে সামলানো যায়– ভূমধ্যসাগরে স্মরণকালের সবচেয়ে মারাত্মক অভিবাসী নৌ বিপর্যয়ের ঘটনা সেই বিতর্ককে উসকে দিয়েছে। ১৯ এপ্রিল লিবিয়ার উপকূলে অভিবাসী বোঝাই একটি নৌকা তলিয়ে গেলে কমপক্ষে ৮০০ জনের মৃত্যু হয়। এই মারাত্মক বেদনাদায়ক ঘটনায় এ বছর ভূমধ্যসাগরে অভিবাসীদের মৃত্যুর সংখ্যা এক ধাক্কায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে; এই সংখ্যা এখন ১৫০০, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ।

কিছু মানুষ পুরো বিষয়টি খতিয়ে না দেখেই ক্রমবর্ধমান এই মৃত্যুর জন্য উত্তর আফ্রিকা থেকে ইতালির উপকূল অভিমুখে বাড়তি হারে অভিবাসীদের বিপৎসংকুল সমুদ্রযাত্রাকেই দায়ী করছেন। অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইওএমের তথ্যানুসারে এ বছর এখন অব্দি তেইশ থেকে চব্বিশ হাজার অভিবাসী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তুলনায় গত বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল– এই ক'মাসে একুশ হাজার মানুষ পার হয়েছেন। অর্থাৎ অভিবাসী সংখ্যা সামান্য বাড়লেও ডুবে মরার সংখ্যা হয়েছে আকাশচুম্বী।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো এত মৃত্যুর জন্য মূলত অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম হ্রাস করাকেই দায়ী করেছে। ইতালির সরকার 'অপারেশন মেয়ার নস্ট্রাম' নামে তাদের অনুসন্ধান-উদ্ধার কার্যক্রমটি ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে স্থগিত করে। রোমের ভাষ্য, তারা এই ব্যাপক কার্যক্রমের ব্যয়ভার আর বহন করতে পারবে না, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য দেশগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। এরপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফ্রনটেক্স 'অপারেশন ট্রাইটন' নামের একটি অভিযান চালু করে।'অপারেশন ট্রাইটন'-এর নির্দেশনা বা ম্যান্ডেট অধুনা বিলুপ্ত 'মেয়ার নস্ট্রাম'-এর মতো হলেও বাজেট অনেক কম–মেয়ার নস্ট্রামের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এবং ইতালীয় উপকূলের মাত্র ৫০ কিলোমিটার সীমানার মধ্যে কার্যক্রম চালাতে সক্ষম; অর্থাৎ গভীর সমুদ্রে বিপদাপন্ন অভিবাসী নৌকাকে সাহায্য করার জন্য কার্যত অসমর্থ। এককথায়, ইউরোপীয়দের নির্লিপ্ততাই অভিবাসী মৃত্যুর জন্য দায়ী।

শুধু সলিলসমাধি বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাই নয়, উত্তর আফ্রিকা থেকে অভিবাসীদের বিপৎসংকুল পথ পাড়ি দেয়ার পুরো ঘটনাটির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। অধিকাংশ অভিবাসী লিবিয়া থেকে ইতালির পথে নৌকায় করে এই পথটি বেছে নেন, কারণ নৌপথে এটিই ভূমধ্যসাগরের পেট চিরে সবচেয়ে কম দূরত্ব। তবে লিবিয়া সব সময় এমন অভিবাসী নৌকার বন্দর ছিল না– ২০১১ সালে ন্যাটোর আগ্রাসনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির ক্ষমতাচ্যুতির ফলে লিবিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সুযোগটিই নিয়েছে মানব পাচারকারী চক্র। নিজ দেশের সীমানার ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় অক্ষম একটি ব্যর্থ ও আইনের শাসনহীন রাষ্ট্রই মানব পাচারের ব্যবসা খোলার উপযুক্ত স্থান। যদি ইউরোপীয় দেশগুলো লিবিয়া থেকে এমন মানব পাচারকারী ও উদ্বাস্তু না-ই চাইত, তাহলে তাদের ওই দেশটাকে এভাবে বোমা মেরে টুকরো টুকরো করাটা উচিত ছিল না, উচিত ছিল না নিষ্ঠুর মিলিশিয়াদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া, যেন তারা অবশিষ্টাংশ নিয়ে কামড়াকামড়ি করতে থাকে। এর চেয়ে ভিন্ন কী ফলাফল তারা আশা করেছিল? একটি বিভক্ত জাতিকে তো ক্রুজ মিসাইল দিয়ে জোড়া লাগানো যায় না, সবার হাতে মেশিনগান তুলে দিয়ে তো শান্তির পৃষ্ঠপোষকতা করা যায় না!

আবার ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়া সকল অভিবাসীই লিবিয়ার নন– সিরিয়া, সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়ার লোকও আছেন। একটি ব্যাপার পলকেই চোখে পড়ে, এই তিনটি দেশই ভয়াবহ অভ্যন্তরীণ সংকটে নিমজ্জিত, পশ্চিমা হস্তক্ষেপের ফলে যা আরো খারাপ হয়েছে। লিবিয়ার মতোই সিরিয়াতেও শান্তি আলাপ-আলোচনা এগিয়ে নিতে পশ্চিমা বিশ্ব চরম উদাসীনতা দেখিয়েছে; বদলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেয়ার অভিযানে নেতৃত্ব দিল, নিষ্ঠুর মিলিশিয়াদের হাতে অস্ত্র তুলে দিল, যেন তারা অবশিষ্টাংশ নিয়ে কামড়াকামড়ি করতে থাকে। পক্ষান্তরে সোমালিয়ায় আপাত পরিণতিহীন সংঘাতের শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় মার্কিন পুতুল স্বৈরশাসক সাইদ বারের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া আইএমএফের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচিজনিত বিশৃঙ্খলার মধ্যে। আফ্রিকায় স্মরণকালের সবচেয়ে জঘন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী এই বারে, কিন্তু মহাদেশটিতে সোভিয়েত প্রভাববলয়ের বিরুদ্ধাচারী হিসেবে ওয়াশিংটনের সমর্থন ছিল তার ওপর। আশির দশকের শেষের দিকে স্নায়ুযুদ্ধ সমাপ্ত হলে, বারের শাসন টিকিয়ে রাখার বিষয়ে ওয়াশিংটনের আগ্রহও ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে, শেষমেশ তার পতন ঘটে এবং দেশটি অরাজকতার গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। সংশ্লিষ্ট সব আঞ্চলিক শক্তির জন্যই এই পাতানো আয়োজনটি বেশ ফলপ্রসূ হয়– কেনিয়া ও ইথিওপিয়া তাদের ভূরাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়।

ইরিত্রিয়াকে পৃথিবীর অন্যতম গরিব দেশ বানানোর পেছনেও পশ্চিমাদের হাত ছিল। ১৯৬১ থেকে '৯১ পর্যন্ত ইরিত্রিয়ার দখলদারিত্ব ধরে রাখতে ইথিওপিয়া এক তিক্ত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। প্রথমে ইথিওপিয়া পেল মার্কিন সমর্থন, পরবর্তীতে সোভিয়েত মদদ। সোমালিয়ার সংঘাতের মতোই ইথিওপিয়ার যুদ্ধেও ইন্ধন জুগিয়েছে আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মার্কিন ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যকার ভূরাজনৈতিক দাবা খেলা।

লিবিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়ায় দশকের পর দশক ধরে ইউরোপ ও বৃহত্তর পশ্চিমা বিশ্বের সামনে একটাই সুযোগ ছিল– হয় শান্তি সমর্থন করা অথবা সংঘাত উৎসাহিত করা। চারটি ক্ষেত্রেই পশ্চিমা বিশ্ব যুদ্ধ, নিপীড়ন ও মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের সরাসরি সহযোগী হয়েছে। যেহেতু ইতিমধ্যে এইসব দেশে যথেষ্ট লুটতরাজ হয়েছে, পশ্চিমা মদদপুষ্ট সংঘাতের ফসল এই উদ্বাস্তুদের এবার তাই ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাগরে ডুবিয়ে মারতেই পারে!

নীতিনির্ধারকরা মানব পাচারকারীদের দায়ী করতে পারেন, নগরদুর্গ ইউরোপের ভালো-মন্দ নিয়ে যা খুশি তাই বলতে পারেন। কিন্তু দিন শেষে পশ্চিমাদের জন্য নৌকার এই অবিরাম ধারা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো যুদ্ধ ও নিপীড়নের সমর্থনে ক্ষান্ত দেয়া। গত শতাব্দীতে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি ইউরোপ যে ঘৃণা দেখিয়েছে, তার পরিবর্তে ভূমধ্যসাগরের এই উদ্বাস্তুদের প্রতি মানবিক আচরণ করার মধ্য দিয়ে এই কাজটি তারা শুরু করতে পারে।

মূল লেখাটি পড়তে দেখুন:
http://www.telesurtv.net/english/analysis/How-Europe-Created-Its-Own-Refugee-Crisis-20150421-0016.html]